তারিখ ১৬ FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্স এবং শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণ প্রসঙ্গে

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্স এবং বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স ও ঘোষিত বিভিন্ন খাতের বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পসে আন্দোলন করে আসছিল। গত ২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীর ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের কিছু কর্মী হামলা চালায়। এ হামলার মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে যায়। এ হামলা হামলার দিক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এ ধরনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত রাজনৈতিক সংঘাতের প্রেক্ষিতে অনাহূত বন্ধ ঘোষণা হয়ে থাকে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান যোগ্য কিনা তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ ঘোষণায় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই এ কথা বলা সঠিক হবে না কারণ ২ ফেব্রুয়ারি অনভিপ্রেত ঘটনার পেছনে একটি রাজনৈতিক যোগসাজশ রয়েছে।

সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুবছর আগেও আন্দোলন হয়েছে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সান্ধ্যকালীন কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন কিন্তু বাণিজ্য অনুষদের চারটি বিভাগে এবং আইন অনুষদে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু রয়েছে। তারপর আবার এ বছর বিষয়টি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো জেগে উঠল আর এই জেগে ওঠাকে অনেকেই পুঁজি করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপটে সান্ধ্যকালীন কোর্সের প্রয়োজনীয়তা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন রয়েছে। দেশে বর্তমানে সরকারি ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম। তাই দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর অনেক শিক্ষার্থীই স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা করার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পায় না। আর এই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রদান করার জন্য দেশে গড়ে উঠেছে শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন, আর বেসরকারি ভাবে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল যা এদেশের মধ্যবিত্ত, প্রান্তিক কৃষক বা শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের জন্য সহজলভ্য নয়। ফলে দেখা যায় দেশের বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আরেকটি বিষয় রয়েছে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা অনেকটা সোনার হরিণ ধরার মতো বিষয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি আসনের বিপরীতে গড়ে প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহলে দেখা যায়, ৫৯ জন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই বিরাট অংশের শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিন্তা করা উচিত। দেখা গেছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এমন শিক্ষার্থীরা এমপিওভুক্ত কলেজ হতে স্নাতক (পাস) পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করে আর তখন তাদের পঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার ব্যবস্থা থাকে না, আর দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আগের মতো স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে ভর্তি হওয়ার কোন সুযোগ না থাকার ফলে দেখা যায় এই শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি জুটে না। তাই এই শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবশ্য চিন্তা করা উচিত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্সের ব্যাপারে আন্দোলনরতদের মত হলো এটা শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করার একটি প্রক্রিয়া, যদি এই সান্ধ্যকালীন কোর্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয় তাহলে অনেক শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করতে পারবে না। তবে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন কলেজ থেকে স্নাতক (পাস) করা শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি এই কোর্স সান্ধ্যকালীন হয় তাহলে আরও ভালো হয় কারণ দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীরা দিবাভাগে কোন কাজ করে সান্ধ্যকালীন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধ করে দিলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে এই প্রক্রিয়া কি বন্ধ হয়ে যাবে? বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাণিজ্য রমরমাভাবে চলছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে যারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তাদের দীর্ঘদিন কোচিং করতে হয়েছে। বর্তমানে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, ভালোভাবে কোচিং না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। দেখা যায় যে, এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীকে কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হয়, ভালোভাবে কোচিং না করলে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। কোচিং সেন্টারগুলোর কোচিং ফি গরিব বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে চালানো সহজ সাধ্য নয় তাই দেখা যায় নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না।

কোচিং সেন্টারগুলো কি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে একটি আইন সিদ্ধ বিষয়? দেশের রাজধানী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত গজিয়ে উঠেছে অগণিত কোচিং সেন্টার। আর এই কোচিং সেন্টারগুলো অবাধ বাণিজ্য বিচরণের মাধ্যমে হাইব্রিড মেধাবী তৈরি করছে। এই কোচিং সেন্টারগুলোর রমরমা বাণিজ্যের পেছনে দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষক মহোদয়দের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, কিছু কিছু কোচিং সেন্টার আছে যেখানে কোচিং নিলে দেশের নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমন পড়ে। আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত ন্যূনতম জিপিএর ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু জিপিএ অর্জনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক বাণিজ্য পরিলক্ষিত হয়। যেসব পরিবার এর আর্থিক সম্পত্তি ভালো তারা তাদের সন্তানদের ভালো গাইড কিনে দিয়ে ও নামকরা কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জোগান দিতে পারে আর এই জোগানের ফলে আর্থিক সম্পত্তি সম্পন্ন পরিবারের সন্তানরা এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো জিপিএ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। আর তারাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে বাণিজ্যিকভাবে হাইব্রিড মেধা তৈরির প্রক্রিয়াটি কি শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণ নয়? এ ধরনের শিক্ষা বাণিজ্যের অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী শিক্ষার ট্র্যাক থেকে ঝরে পড়ে। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া রুখতে না পারলে সঠিক মেধাবী শিক্ষার্থীরা মূল্যায়িত হবে না। শিক্ষাকে বাণিজ্য পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কোচিং ও গাইড বাণিজ্য সর্বাগ্রে বন্ধ করতে হবে। সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু অর্থ এই নয় যে, শিক্ষা বাণিজ্য পণ্যে পরিণত হয়ে গেল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু হলে শিক্ষাবঞ্চিতরা উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবে, তবে এ ক্ষেত্রে টিউশন ফি ও অন্য ধার্য ফিসমূহ দিবাকালীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমামাস্য রেখে নির্ধারণ করা উচিত। 'শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার' এই স্লোগানকে যারা বিশ্বাস করে, তাদের উচিত বাণিজ্য ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা এবং যেসব শিক্ষক মহোদয়েরা গাইড বই রচনা করছেন তাদের এ ধরনের লেখনী বাণিজ্য থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হলে যারা দিবাকালীন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি তারা সান্ধ্যকালীন কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তাই দিবা ও সান্ধ্যকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আগামী ২৬ সাল নাগাদ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আর্থিক ব্যয়ের ৫০ শতাংশ মিটাবে তাদের নিজস্ব আয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি উৎপাদন করে, এটা কি কোন শিল্প কারখানা, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় মেটানোর অর্থের সংস্থান করবে কোথা থেকে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ের ফি বাড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন এভাবে ফি বাড়িয়ে দিয়ে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব? অবশ্যই না, ব্যয়ভার মেটাতে হলে টিউশন ফি বাড়াতে হবে আর টিউশন ফি বাড়ালে উচ্চ শিক্ষা দেশের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কাজ করে এ দেশের পাটসহ অনেক শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, ফলে বহু কর্মক্ষম মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু দেশের মানুষের শিক্ষা ও মেধা থাকার ফলে পাট শিল্পের বিকল্প কর্মসংস্থান করতে পেরেছে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে পঙ্গু করে দিলে দেশের মানুষ বিকল্প চিন্তা করার সক্ষমতা হারাবে আর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে না তাই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের শর্ত এর বেড়াজালের বাইরে বিকল্প চিন্তা করা উচিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধিত পরীক্ষার ফি শুধু রাজশাহীর শিক্ষার্থীর মাথাব্যথা না এটা বর্তমানে জাতীয় সমস্যা আর জাতীয়ভাবেই এই নিরসন করা উচিত।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণের বিষয়ে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের ফলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যতই অস্থিতিশীল থাকবে ততই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সুগম হবে। দেখা যায় বিদেশি মোড়লরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞজনদের উপদেশ দিয়ে থাকে। তাই দেশের বিশিষ্টজন ও রাজনীতিবিদদের উচিত দেশের সার্বিক দিক বিবেচনা করে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচির ঘোষণা করা।

[লেখক : কলামিস্ট]